Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 544 – 554
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

শ্রী অরবিন্দের চিন্তনে সত্তার রূপান্তর : একটি দার্শনিক সমীক্ষা

সৃজনী রায়
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ
ড. বি.আর. আম্বেদকার শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
Email ID : raysrijani87@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Sri Aurobindo, Philosophical Analysis, Soul, Human being.

Abstract

If there is a creation, there is a cause behind it. According to this rule there is a theory behind the creation of human kind which is called the theory of Evolution. Man is the supreme creature of this theory of evolution where inside is manifested. It is an eternal desire of a human being to motivate his life with a supreme idea. Sri Aurobindo has revealed such a supreme idea to motivate the human being. He has explained that how a man will reach the goal that is called supramental consciousness through cosmic consciousness after crossing all the levels of mind. Shri Aurobindo has wished to establish a Divine Life in this world through the transformation of an individual soul. It is the fact that man is an evolutionary object of an amoeba, similarly like this process divine man will come after the man. To fulfil his dream man must transform his individual soul to the cosmic soul and through this process man will be transformed to be a divine man.

Discussion

ভূমিকা (Intraduction) **:** যে কোন সৃষ্টির পশ্চাতে কারণ স্বরূপ কোন না কোন তত্ত্ব লুকিয়ে থাকে যাকে আমাদের প্রজ্ঞা কখনো অস্বীকার করতে পারে না। সেই সূত্র ধরেই বলা যায় বর্তমান বিশ্বের বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মননশীল ও সর্বোপরি চেতন মনুষ্য সমাজের সৃষ্টির পেছনেও ঠিক একই ভাবে আছে একটি তত্ত্ব যাকে আমরা বলে থাকি বিবর্তনের তত্ত্ব। বিবর্তনের ধারায় মানুষই একমাত্র সেই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী যেখানে ঘটে প্রজ্ঞানের প্রকাশ। মনুষ্যেতর জীবের ন্যায় শুধুমাত্র দৈহিক চাহিদার পরিতৃপ্তিতে সে সন্তুষ্ট নয়। এমনকি শুধুমাত্র মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তিতেও সন্তুষ্ট হতে পারে না সে। একটা উচ্চ আদর্শের প্রেরণায় সেই আদর্শকে সামনে রেখে জীবনে কিছু একটা হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা তাঁর চিরদিনের কামনা ও সাধনা।

শ্রী অরবিন্দও মনুষ্য জীবনে একটি উচ্চতর আদর্শের দিক নির্দেশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে চেতনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে মানুষের বিশ্বচৈতন্যের স্তরে উত্তরণ ঘটে, এবং তারপর সেই স্তরও অতিক্রম করে বিশ্বাতীত চৈতন্যে মানুষ চরম পরিণতি লাভ করে। অর্থাৎ শ্রী অরবিন্দের ভাষায় বিজ্ঞানঘন পুরুষের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে মানুষ।শ্রী অরবিন্দ তাঁর নিজের জীবনে বিজ্ঞানঘন পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। এই বিষয়ের বিশদ্ আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে শ্রী অরবিন্দের এই আধ্যাত্মিক চেতনার প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে তাঁর সেই সময়কার কর্মকাণ্ডের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। তাই খুব সংক্ষেপে সেই পটভূমিটি তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণা পত্রে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ভারতবর্ষে যে কয়েকজন মহাপুরুষের জন্ম হয় তাঁর মধ্যে শ্রী অরবিন্দ অন্যতম। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট কলকাতা শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ডক্টর কৃষ্ণধন ঘোষ ও স্বর্ণলতা দেবীর তৃতীয় সন্তান ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। পিতার ইচ্ছায় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার উদ্দেশ্যে মাত্র ৭ বছর বয়সে সপরিবারে তিনি বিলেতে যাত্রা করেন। পরবর্তীকালে তিনি বরোদার মহারাজার স্টেটে চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন ১৮৯৩ সালে। বিদেশে থাকাকালীন ইংরেজি ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি ল্যাটিন, ফরাসি ও গ্রিক ভাষায় তিনি পারদর্শী হয়েছিলেন। দেশে ফিরে এসে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য ও দর্শন আদ্যপান্ত পড়ে ফেলেন তিনি। হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। শিশুকাল থেকেই তাঁর মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ পায়। কবিতা লেখায় তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী।

বিদেশে থাকাকালীন তাঁর নিজের দেশ পরাধীন ভারতবর্ষের যন্ত্রণা তাকে ব্যথিত করেছিল। তখন থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত করতে হবে। তাই দেশে ফিরে আসার পর তাঁর অন্তরে চলতে থাকে ভারতবর্ষকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার সাধনা।

দেশে ফিরে আসার পর জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন। এই সময় 'ইন্দুপ্রকাশ' ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর দেশের মানুষকে একত্রিত করার জন্য ক্ষুরধার বাণী ও রচনা প্রকাশ পায়। চরমপন্থী বিপ্লবী হিসেবে পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখতেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের জোয়ার ওঠে, অরবিন্দ তাঁর পুরোভাগে ছিলেন। এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল প্রতিষ্ঠিত 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা পরিচালনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এই পত্রিকায় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তীব্র স্বাদেশিকতার বাণী তিনি প্রকাশ করতে থাকেন। 'যুগান্তর' পত্রিকার মাধ্যমেও তিনি তাঁর বিপ্লববাত্মক বাণী প্রচার করেন।[১]

১৯০৮ সালে কিংসফোর্ডকে হত্যা প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে মানিকতলায় গড়ে ওঠে গুপ্ত-বিপ্লবী কেন্দ্র। অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ছিলেন এই কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ দায়িত্বে। এই সময় কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী দুই নিরপরাধ মহিলাকে হত্যা করে। ঘটনাচক্রে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হয় এবং পুরো এক বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়। জেলে থাকাকালীন তিনি নির্জনে সাধনায় নিমগ্ন হন। ঐতিহাসিক তথ্য বলছে তিনি কারাবাস জীবনে পেয়েছিলেন ভগবানের আন্তর সান্নিধ্য। জেলখানার সর্বত্র তিনি ভগবানের মূর্তি দর্শন করেছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ 'কারাকাহিনীতে' নিজে বলেছেন নিম্ন আদালতে মোকদ্দমা ওঠার সময় একদিন জেলের সর্বত্র তিনি স্বয়ং শ্রী বাসুদেব কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেন। যেদিকেই তিনি দৃষ্টি দিচ্ছেন, ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে, সরকার পক্ষের উকিলের দিকে, সর্বত্র তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু, সখা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করছেন।[২]

এই ঐতিহাসিক মামলায় অরবিন্দের পক্ষে সওয়াল করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। এই মামলাতে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হন অরবিন্দ ঘোষ। ১৯০৯ সালে তিনি মুক্তি পান। জেল থেকে বেরোনোর পর সকলে তাঁকে দেখেন এক নতুন মানুষ রূপে। পরিচিত ও অপরিচিতদের কাছে তিনি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এই সময় রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষযোগ তাঁর কমে আসতে থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসনের কুদৃষ্টি থেকে তিনি তখনও মুক্ত হতে পারেননি। তিনি শুনতে পেলেন ব্রিটিশ সরকারের হাতে তিনি আবারও গ্রেপ্তার হতে পারেন। তিনি মনে করলেন তাঁর এই সন্দেহ যদি সত্যি হয় তাহলে শ্রী ভগবান যে উদ্দেশ্যে তাঁকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন তা অপূর্ণ

থেকে যাবে। কারাকাহিনীতে তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি অন্তরে উপলব্ধি করলেন শ্রী ভগবান যেন তাঁকে অন্য কাজের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলছেন।[৩]

এই উপলব্ধির কথা স্মরণ করে শ্রী ভগবানের নির্দেশিত কাজ শেষ করার তাগিদে **১৯১০** সালের এপ্রিল মাসে ফরাসি অধিকৃত পন্ডিচেরির উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করেন এবং বাকি জীবন সেই খানেই সাধনায় অতিবাহিত করেন। তাঁকে কেন্দ্র করে সেখানে গড়ে ওঠে অরবিন্দ আশ্রম। এই সময় ইতিহাস বলছে অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি এবং তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের গোড়াপত্তন হয়।

শ্রী অরবিন্দের আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রূপে আত্মপ্রকাশ করেন ফরাসি দেশ থেকে আগত মীরা রিশার, যিনি পরবর্তীকালে ঋষি অরবিন্দের দর্শনের ইতিহাসে 'শ্রীমা' নামে পরিচিতি লাভ করেন। এই মহান ব্যক্তিদ্বয়ের যে ঐশ্বরিক উপলব্ধি হয়েছিল তা কিন্তু শুধুই তাত্ত্বিক আলোচনাতে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই তাত্ত্বিক আলোচনাকে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তথা তাঁদের উপলব্ধ সত্যকে বাস্তবায়নের জন্য পন্ডিচেরিতে গড়ে ওঠে শ্রী অরবিন্দ আশ্রম তথা অরোভিল। এই আশ্রম হল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের মিলনের তথা বিশ্ব মিলনের এক অপূর্ব শক্তিকেন্দ্র। দৈনন্দিন আত্মসংযমূলক কর্মধারা পূর্ণযোগ সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে ঘটে চেতনার ক্রমিক উত্তরণ। একমাত্র মানুষই পারে ব্যক্তিচেতনা থেকে বিশ্বচেতনা, বিশ্বচেতনা থেকে বিশ্বাতীত চেতনায় প্রবেশের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ সত্তার রূপান্তর ঘটাতে।

তাই বলা যায় এইরকম ভাবাদর্শ নিয়ে যে আশ্রম গড়ে উঠলো তার পিছনে যে দার্শনিক চিন্তন ও মনন ক্রিয়াশীল সেটি উপলব্ধি করার আগ্রহ নিয়ে অরবিন্দচেতনার স্বরূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই লেখায় প্রবৃত্ত হলাম। বর্তমান গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য তাই শ্রী অরবিন্দের মননে চেতনা কিভাবে বিশ্বচেতনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক রূপান্তর ঘটাতে পারে সে বিষয়ে অন্বেষণমূলক পর্যালোচনা করা। একইসঙ্গে জগৎ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যক্তিসত্তার দিব্যসত্তায় রূপান্তর কিভাবে সম্ভব তারও বিশ্লেষণ করা বর্তমান গবেষণা পত্রটির উদ্দেশ্য।

সত্তার রূপান্তরে বিশ্বচেতনার প্রাসঙ্গিকতা (Relevance of Cosmic Consciousness regarding transformation of soul) **:**

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ না করলে এই গবেষণাপত্রটির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয় না। সেটি হল শ্রী অরবিন্দ চৈতন্যের উত্তরণ দেখাতে গিয়ে চেতনার সর্বোচ্চ স্তর বিশ্বাতীত চেতনায় প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু উক্ত গবেষণা পত্রে বিশ্বাতীত চেতনার ঠিক নিম্নবর্তী স্তর বিশ্বচেতনা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। তার কারণ সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে আত্মসত্তার বিকাশ বা রূপান্তর কিভাবে বিশ্বচেতনার দ্বারা সমর্থিত হয় তা দেখানোই এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য।

অন্য ভাবে বলা যায় আগে তো ব্যক্তিসত্তা তথা সামাজিক সত্তার দিব্য-রূপান্তর ঘটুক। তারপর বিশ্বাতীত চৈতন্যের অনুসন্ধান করা হবে। এ কথা সত্য যে শ্রী অরবিন্দের মূল লক্ষ্য বিশ্বাতীত চৈতন্যের উপলব্ধি বা বিশ্বাতীত চৈতন্যে উত্তরণ। কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সর্বোচ্চ ধাপ যে বিশ্বচৈতন্য তার সঠিক ধারণা বা পর্যালোচনা ছাড়া ব্যক্তি তথা সমাজের সামগ্রিক রূপান্তর সম্ভব নয় সেই উদ্দেশ্যেই বিশ্বকে অতিক্রম করার স্তরটি অপেক্ষা বিশ্বচেতনার স্তরটি নিয়ে অধিক গুরুত্ব সহকারে গবেষণাপত্রে আলোচনা হয়েছে।

আমাদের বিশ্লেষণমূলক চিন্তনের স্বাভাবিক যুক্তি এটাই বলে যে জগতের দৃষ্টিতে আগে বিশ্বচেতনার উপলব্ধি হলে তবেই সেই বিশ্বচেতনাকে পাথেয় করে বিশ্বাতীত চেতনায় উত্তরণ সহজ হবে। জগৎ ও জীবনকে অতিক্রম করে সম্পূর্ণ বিমূর্ত ভাবনায় বিশ্বাতীত চৈতন্যের পর্যালোচনা তাই গবেষকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

শ্রী অরবিন্দ চেয়েছিলেন এই জগতে দিব্য-জীবন প্রতিষ্ঠা করতে। ব্যক্তিসত্তার দিব্যসত্ত্বায় রূপান্তর ঘটাতে। বিবর্তনের ক্রমপর্যায়ে যেভাবে এককোষী প্রাণী থেকে বর্তমান যুগের বিচার বুদ্ধিশীল চেতন মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, সেই একইভাবেই একদিন দিব্য মানবের আবির্ভাব হবে- এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাই সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিশ্বচেতনার পর্যালোচনা বর্তমান গবেষণা পত্রে প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে আবর্তিত হয়েছে। শুধু তাই নয় শ্রী অরবিন্দের বিশ্বচৈতন্যের

ধারণার বাস্তবিক প্রয়োগ আদৌ সম্ভব কিনা বা সম্ভব হলে কিভাবে তা সম্ভব তা অন্বেষণ করাও এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য।

মনের স্তরবিন্যাসে বিশ্বচেতনার অবস্থান (Position of Cosmic Consciousness in the level of Mind) **:**
তাঁর দর্শনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল মনের বিভিন্ন স্তরবিন্যাস স্বীকার করা। এগুলি হল যথাক্রমে-উচ্চতর মন, প্রভাস মন বোধিমন এবং অধিমন। উচ্চতর মনের কাজ হল পূর্ণ জ্ঞানের অংশবিশেষ কে প্রকাশ করা। এর পরবর্তী স্তর হলো প্রভাস মন। মনের এই স্তর উচ্চতর মনের শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী। প্রভাস মনের পরবর্তী স্তর হল বোধিমানুষের স্তর। এই স্তরে উচ্চতর মন ও প্রভাস মন সম্মিলিতভাবে পূর্ণরূপে শক্তিমান হয়ে ওঠে। শ্রী অরবিন্দ যে রূপান্তরের কথা বলেন তাতে মনের সকল স্তর ও বৃত্তিকে বোধিতে রূপান্তরিত করতে হবে সবার আগে। উত্তর মন, প্রভাস মন ও বোধিমনের বিশ্লেষণের পর চেতনার উত্তরণ ঘটে অধিমানস পর্যায়ে। এই অধিমানসের স্তরের অপর নাম বিশ্বচেতনার জাগরণের স্তর।

এই স্তরে বিশ্বচেতনার শক্তি প্রকট ভাবে প্রকাশিত হয়। আর তার ফলেই অতিমানসে আরোহণ বা অতিমানসের অবতরণ সম্ভব হয়। এই স্তরে অহম্ বোধ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে বিশ্বাত্মার উপলব্ধি হয়। এই স্তরে থাকে বিশ্বসত্তা, বিশ্বচেতনা, বিশ্বশক্তির লীলা ও বিপুল আনন্দ।[৪]

এই স্তরে ব্যক্তি নিজের সত্তায় সমগ্র বিশ্বকে এবং সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নিজের সত্তাকে অনুভব করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই ব্যক্তিসত্তা কিন্তু অহং সত্তা নয়। আত্মচেতনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি নিজেকে বিশ্বসত্তায় পরিণত করে। অধিমানস রূপান্তর রূপান্তরের চূড়ান্ত পর্যায়। উচ্চতর মন, প্রভাস মন ও বোধিমন - এই সকল স্তরেরই সমৃদ্ধি ঘটে এই অধিমানসের স্তরে। তবে এই স্তরে বিশ্বচেতনা ও শক্তির প্রসার এতটাই বেশি যে অতিমানসের দিব্যজ্ঞান ও দিব্য আনন্দ এখানে প্রকট হয়। মনের থেকে উৎকৃষ্ট স্তর হলেও মনে যে বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দ্ব ও বিভেদ সৃষ্টি হয় তা এই স্তরেই সমগ্রতার প্রয়োজনে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরকরূপে সহাবস্থান করে। আবার এই স্তরেই অখণ্ড বিশ্বচেতনার জ্ঞান হয়। তাই বলা যায় অধিমানসের স্তর একদিকে খণ্ডতা ও অখণ্ডতার আধার, আবার অপরদিকে অতিমানস ও বিশ্বের সংযোগস্থল।[৫]

ইশোপনিষদে ঋষি বলেছিলেন 'যিনি সমুদয়বস্তুই আত্মাতে এবং সমুদয় বস্তুতেই আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই দর্শনের বলে কাউকে কখনো ঘৃণা করেনা। এই সমস্ত একত্ব দর্শনের জন্য চাই বিশ্বচেতনার উপলব্ধি। কারণ আমাদের প্রকৃত আত্মা বিশ্বব্যাপী অনন্ত, তা সর্বভূতের সঙ্গে এক এবং সর্বভূতের মধ্যে অধিষ্ঠিত। আমার মধ্যে যে আত্মা বিরাজিত জগতের আর সকল প্রাণীর মধ্যেও সেই একই আত্মা বিরাজিত। সব কিছুই এক অখন্ড ব্রহ্মসত্তার প্রকাশ - এই উপলব্ধি সম্ভব একমাত্র বিশ্বচেতনা স্তরে।

ত্রিপর্বা রূপান্তর (The three types of transformations) **:**
অতিমানসের শক্তি বা জ্যোতিকে ধারণ করবার সামর্থ্য উত্তর মন, প্রভাস মন বা বোধিমনের নেই। এই শক্তিকে ধারণ করবার ক্ষমতা আছে একমাত্র অধিমন বা বিশ্বচেতনার। অতিমানসের শক্তি বা আলোক যখন সত্তার রূপান্তর ঘটায় তখন শ্রী অরবিন্দ ত্রিপর্বা রূপান্তরের মাধ্যমে তাকে ব্যাখ্যা করেন। এই ত্রিপর্বা রূপান্তর হল যথাক্রমে - চৈত্যরূপান্তর, চিন্ময় রূপান্তর ও অতিমানস রূপান্তর। সাধকের হৃদয় প্রদেশে পরমসত্তার যে অংশ অতি সূক্ষ্মভাবে সুপ্ত হয়ে আছে তাকে জাগ্রত করে স্থাপন করতে হবে জীবনের পুরোভাগে। একে বলে চৈত্য রূপান্তর।

চৈত্য রূপান্তরের পরবর্তী ধাপ হল চিন্ময় রূপান্তর। অর্থাৎ যে অখন্ড সচ্চিদানন্দ সত্তার প্রতিনিধিত্ব চৈত্য পুরুষ বা জীবাত্মা করছে সেই সত্তার সঙ্গে অপরোক্ষ নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন। এই সংযোগ স্থাপিত হলে চেতনা প্রবেশ করবে সমস্ত আকার আকৃতির ঊর্ধ্বে রূপহীন নামহীন নিরাকার নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে। সাধক তখন পরম সত্তার

সম্যক উপলব্ধি লাভ করবে। সাধকের চেতনা পরিণত হবে বিশ্বচেতনায়। বিশ্বচেতনার স্তরেই চিন্ময় রূপান্তর হয়।[৬] চিন্ময় রূপান্তরের পরবর্তী ধাপ হল অতিমানস রূপান্তর- যা সম্ভব হবে বা বিশ্বাতীত চৈতন্যের স্তরে।

অধিমানসের স্তর বা বিশ্বচেতনার স্তরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে অতিমানসস্তরে পৌঁছানো সম্ভব হতো না। আবার অতিমানস লোকের শক্তি বা জ্যোতিকে নিম্নস্তরে অবতরণ করানো সম্ভব হতো না।সকল আধ্যাত্মিক বিবর্তনেরই গতি হল এমন এক জ্ঞানলাভ করা যা সনাতন, অনন্ত, শাশ্বত ও পরমার্থসৎ। এই রকম জ্ঞানকে লাভ করার অর্থ এমন এক চেতনাকে লাভ করা যা সাধারন চেতনা থেকে ভিন্ন, এই চেতনাই বিশ্বাতীত চেতনা। একেই অরবিন্দ বলেছেন ঋতচিৎ বা ঋতচেতনা।

এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয় হল পরমসৎ, ভগবান অনন্ত, পরমার্থসৎ। এই পরমসৎ এর সম্বন্ধ আছে আমাদের ব্যষ্টিসত্তার সঙ্গে এবং বিশ্বের সঙ্গে। আবার তিনি ব্যষ্টিসত্তা ও বিশ্বের অতীত। তিনি আসলে কি? এর উত্তরে বলতে হয় সাধারণ মানবীয় জ্ঞান ও প্রাকৃত বিজ্ঞানের সীমার উর্ধ্বে এমন এক জ্ঞান, এমন এক ঋতচেতনা আছে যা আমাদের বুদ্ধিশক্তির অতীত। এই জ্ঞান অনপেক্ষ সনাতনের জ্ঞান, যা সকল খন্ড খন্ড বিচ্ছিন্ন জ্ঞানগুলিকে যুক্ত করে এক পরম সত্যের সঙ্গে। এই জ্ঞানকে পেতে হলে মন ছাড়িয়ে ঋতচেতনার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। এই খানে যে আত্মাকে পাওয়া যায়, তা হল এক মহান স্ফুরন্ত চিৎপুরুষ যা ব্যষ্টিগত, বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত।

বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধে পরমসৎ হলেন ব্রহ্ম, একমাত্র সদ্বস্তু যা বিশ্বের সব কিছুর মূল। এই সমগ্র বিশ্ব এমনি এক পরম সন্মাত্রের খেলা ও রূপ। আমাদের পরমাত্মা এবং এই পরমসন্মাত্র, যা এই বিশ্ব হয়েছে - এরা একই চিৎপুরুষ, একই আত্মা ও একই সত্তা।

আবার এই পরমসন্মাত্র জীব ও বিশ্বের অনপেক্ষ। সুতরাং এক অধ্যাত্মজ্ঞানে পরম চিৎপুরুষের এই দুই শক্তিকে অতিক্রম করে বিশ্বাতীত সত্যে উপনীত হওয়া যায়। এই সত্যই হল অনির্বচনীয় আনন্দ চিৎ ও সৎ। এই সত্যলাভ মনের কাছে অজ্ঞেয় হতে পারে কিন্তু ব্যক্তি তার ব্যষ্টিসত্তা এবং বিশ্বের সব নাম ও রূপের মধ্য দিয়ে এই পরমার্থসৎ এর উপলব্ধি করতে পারে। আর এই উপলব্ধির মধ্যে আমরা পাই আমাদের প্রকৃত আত্মা, আমাদের চেতনার মধ্যে এই পরমার্থসতের স্বরূপ। এই পরমার্থসৎ এর মধ্যে একদিকে আছে ঐক্য আবার অপরদিকে আছে সকল বিশ্বের অগণিত বহু। এর মধ্যে একদিকে আছে ব্যষ্টির সকল অন্তঃপুরুষ তাই সে বহু। আবার যখন সে সবকিছুর উর্ধ্বে তখন এক সত্তা। এই হল বিরাট পুরুষ ও বিশ্বাতীত চিৎপুরুষ,পরম আত্মা, পরম পুরুষ ও পরমশক্তি নিত্য ও অজাত।[৭]

অতিমানস চেতনার অবস্থান (Position of Supramental Consciousness) **:**

যে চেতনায় বিশ্বাতীত পরমার্থসৎ কে জানা যায়, আর জানা যায় যে জীব ও বিশ্ব তারই পরিণাম- সেই চেতনাই সর্বশেষ শাশ্বত জ্ঞান। এই হল পূর্ণজ্ঞান কারণ আমরা জানি যে সর্বত্র এবং সকল অবস্থাতে যে চোখ দেখে তার কাছে সবকিছুই 'একম'। দিব্যঅনুভূতিতে সবকিছুই সেই ভগবানের এক অখণ্ডসত্তার অংশ। দেখা গেল যে পরমাত্মা, ভগবান, পরমসৎবস্তু, - এই সকল বিভাবের মধ্যে 'একম'- একই যৌগিক জ্ঞানের বিষয়। বিভাব বলতে এখানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বা দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায়। আবার সমত্ব বা একত্ব দর্শনের জন্য চাই বিশ্বচেতনার উপলব্ধি। কারণ আমাদের প্রকৃত আত্মা ব্যষ্টিমানসিক সত্তা নয়, তা হল এক সংকেত,এক বাহ্যরূপ। আমাদের প্রকৃত আত্মা বিশ্বব্যাপী, অনন্ত, তা সর্বভূতের সঙ্গে এক ও সর্বভূতের মধ্যে অধিষ্ঠিত। আমার মধ্যে যে আত্মা বিরাজিত জগতের আর সকল প্রাণীর মধ্যেও সেই একই আত্মা বিরাজিত।

এই যে উপলব্ধি – যে সকল বিষয়েই একই ব্রহ্মসত্তা বিরাজিত সেই উপলব্ধিকে আমরা তিন ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, প্রথম উপলব্ধি হল সকল সত্তায় বিরাজিত এক আত্মসত্তা যা সবকিছুকে নিজের মধ্যে ধারণ করেন।

দ্বিতীয় উপলব্ধি হল - এই পরমসৎ কে, যে মন দিয়ে দেখতে এবং তার মানসিক সত্তায় অনুভব করতে চেষ্টা করেন, সে এই বিরাট চেতন ও আনন্দময় সত্তার সঙ্গে তাঁর অন্তঃস্থ আত্মার একত্ব অনুভব করে। এই উপলব্ধিতে অতিমানসিক উপলব্ধির দ্বারা চেতনার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়।

আর তৃতীয় প্রকার উপলব্ধিতে পরিবর্তন উত্তরোত্তর শক্তিশালী হতে হতে শেষ পর্যায়ে আসে সম্ভূতির পরিবর্তন, আর তার ফলে আমরা যা দেখি তাই হই। এখানে চেতনা একদিক থেকে বিশ্বাত্মক আবার অপর দিক থেকে বিশ্বাতীত; কারণ আত্মচেতনা একদিক থেকে সর্বভূতের সঙ্গে মিশে এক, আবার অপর দিক থেকে পরম চেতনা হিসেবে সর্বভূতের থেকে অতিরিক্ত। এই অবস্থায় আত্মসচেতন সম্ভূতি সর্বভূতে নিজেকেই প্রত্যক্ষ করে। এই উপলব্ধির ফলে যে ব্যষ্টিমন, প্রাণ ও দেহ থেকে আমরা সরে এসেছিলাম, আমাদের প্রকৃত সত্তা নয় বলে, সেই সবকেই আমরা ফিরে পাব আত্মার প্রকৃত সম্ভূতিরূপে।[৮]

এর ফলে আমাদের এই অনুভব আসবে যে ভৌতিক জগতের সকল চেতনা আমাদের শরীর চেতনার সঙ্গে এক, চারিদিককার বিশ্বব্যাপী প্রাণের সকল ক্রিয়াশক্তি আমাদেরই আপন ক্রিয়াশক্তি, বিশ্বব্যাপী সর্বত্র আমাদের হৃদস্পন্দনের প্রতিধ্বনি, বিশ্বমনের সকল ক্রিয়া আমাদেরই মানসিকতার মধ্যে প্রবাহমান। এই যে ঐক্য তার সকল মন-প্রাণ জড়কে আলিঙ্গন করে থাকে এক অতিমানসিক সত্যের আলোকে ও আধ্যাত্মিক আনন্দের স্পন্দনে। সম্পূর্ণ বিশ্বচেতনার মধ্যে এটিই আমাদের কাছে এক আভ্যন্তরীণ ভাগবৎ চরিতার্থতা।

এই অতিমানস বিজ্ঞানে আরোহণ করলে সাধকের এই উপলব্ধি হবে যে জীব,জগৎ,ব্রহ্ম সকলেই একই সমন্বয়ের সূত্রে যুক্ত, একই অখণ্ড সত্তার তিনটি দিক মাত্র। এই জন্যই শ্রী অরবিন্দ জগতকে মায়ার খেলা বলে উড়িয়ে দেননি। পুরুষোত্তমের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি এই সৃষ্টির উৎস। এই চিন্ময়ী মহাশক্তি নেমে আসে জড় প্রকৃতির মধ্যে। এই চিন্ময়ী মহাশক্তি এই পার্থিব জগতেই করবে অতিমানস শক্তির প্রতিষ্ঠা। মর্ত্যধামেই একদিন গড়ে উঠবে দিব্যধাম, মানুষই পরিণত হবে দিব্যমানবে। এটি ছিল শ্রী অরবিন্দের স্বপ্ন। এই কারণেই তিনি মায়াকে ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি বলে বিবেচনা করেছেন। তার ফলে শ্রী অরবিন্দের কাছে একই মায়া অখণ্ড দর্শনে দেবমায়া বলে গণ্য হয় এবং খণ্ডিত দর্শনে অদেবীমায়া বলে পরিগণিত হয়। দেবমায়া ব্রহ্মের সৃষ্টির শক্তি, পুরাণকার যাকে বলেছেন যোগমায়া বা মহামায়া। আর অদেবীমায়া জীবের দৃষ্টির ভুল। বৌদ্ধ এবং শংকর বেদান্তে যার কথা স্বীকৃত আছে। এই দৃষ্টির ভুলটাকেই অনেকে মনে করেছেন সৃষ্টির শক্তি। আসলে দৃষ্টির ভুল হল মনের মায়া। সমস্ত সৃষ্টির উপর সে একটা অর্থের আরোপ করে। কিন্তু তাতে সৃষ্টির মূলে যে শক্তির কাজ তার কোন খবর পাওয়া যায় না। সৃষ্টির রহস্যই বোঝা যায় না।[৯]

মানবিক সমস্যার সমাধানে বিশ্বচেতনার ভূমিকা (Importance of Cosmic Consciousness to solve the problems of mankind) **:**

মানুষের জীবন বিবিধ সমস্যায় দীর্ণ জর্জরিত। অজ্ঞান ও দুর্বলতা প্রতি পদে পদে তাদের পায়ে যেন শিকল পরিয়ে রেখেছে, যার কারণে জ্ঞানালোকের সত্য পথে সে যেন প্রবেশই করতে পারছে না। বাহ্যিক সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ায় মানুষ তার জীবনের পরমলক্ষ্য, চরমমূল্যকে যেন ভুলতে বসেছে। সচ্চিদানন্দময়ী পরমসত্তাকে জানার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই ব্যক্তিমানুষের। ফলস্বরূপ বিভ্রান্ত হচ্ছে মানবিক সত্তা।

বলা বাহুল্য, মানব জীবনের একটি চরম লক্ষ্য রয়েছে। নিছক দৈনন্দিতার মধ্যে আবদ্ধ থাকা প্রকৃত মনুষ্যজীবনের কাম্য হতে পারে না। ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিত থেকে বলা যায়, চার্বাক ব্যতীত প্রায় সকল ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় একথা স্বীকার করেন যে, মনুষ্য জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হল নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করা।তবে এ কথা সত্য মোক্ষের স্বরূপ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতের ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু উচ্চতর উচ্চতম আদর্শে উত্তরণের প্রচেষ্টা বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে রয়েছে। যদিও সব মানুষ সবসময় সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অনুকূল পরিবেশ বা সুযোগ পায় না। কিন্তু উত্তরণের আকাঙ্ক্ষাটি থাকে। এখন,কখনো কখনো এমন কিছু মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে, যাঁদের প্রচারিত আদর্শ, শিক্ষা, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাট এক পরিবর্তন এনে দেয়। যার ফলস্বরূপ ব্যক্তি-মানুষ তার জীবনের লক্ষ্যপূরণে উচ্চতর আদর্শ লাভে সচেষ্ট হয়। এমন বহু মহান পুরুষের আবির্ভাব ভারতবর্ষের মাটিতেই সম্ভব হয়েছে, সেকথা আমরা সকলেই জানি। ঋষি অরবিন্দ ছিলেন এমনই এক মহান পুরুষ যাঁর আদর্শে

বহু মানুষের ব্যাক্তিজীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। সত্তার আমূল রূপান্তর সম্ভব হয়েছিল। এই পত্রে আমরা ঋষি অরবিন্দের বিশ্বচৈতন্যের প্রায়োগিক গুরুত্বের দিকটি পর্যালোচনা করার প্রচেষ্টা করব।

এই অবস্থায় স্বাভাবিক যুক্তি বলে যদি মানবসত্তা এক সচ্চিদানন্দময় পরমসত্তার প্রকাশ হয়ে থাকে তাহলে কেন পরম সত্তাকে জানতে এত অনীহা মানুষের?

প্রথমে আমরা ব্যক্তিজীবনের কিছু সমস্যাকে নির্দিষ্ট করে নেওয়ার চেষ্টা করব। তারপর সেই সমস্যায় শ্রী অরবিন্দের বিশ্বচেতনা কি সমাধান দিয়েছে বা আদৌ দিতে পারে কিনা সেবিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

বাস্তবিকপক্ষে প্রাণ, মন যদি এক সচ্চিদানন্দ থেকেই আসে, তাহলে তার মধ্যে কেন এত বিভাজন থাকে? মানুষ মানুষকে বঞ্চনা করে, মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে, আবার মানুষই মানুষকে হত্যা করে- কিন্তু কেন? এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে।

এই সমস্যার উত্তরে বলা যায়- শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে সকল বস্তু জগত, দেহ, প্রাণ,মন এক বিশ্বচেতনা থেকে এসেছে। তাই দেহ প্রাণ মন জড়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই বিশ্ব হচ্ছে বহুত্বের মধ্যে একত্ব। বহু ও একের মধ্যে কোন দূরত্ব নেই। কারণ দুই-এরই উৎসস্থল এক। বাস্তব জড় হচ্ছে রূপ, যার মাধ্যমে ঈশ্বর আবির্ভূত হন। বিশ্বসৃষ্টির জন্য ব্রহ্ম বা পরমসত্তার চাই এক কাঠামো যার মাধ্যমে ব্রহ্ম বিশ্ব প্রকৃতি সৃজন করবেন। এই কাঠামো হচ্ছে দেশ ও কাল। যা কিছু সৃষ্টি সবই দেশ ও কালের গণ্ডিতে আবর্তিত হয়। দেশকাল ছাড়া বিশ্বপ্রকৃতির প্রকাশ সম্ভব নয়। দেশ কালের মধ্যে বাহ্যিক জগত সম্পূর্ণ ভাবে দেখা দেয় না। তা বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাই পরমকর্তার অখণ্ড প্রকাশকে ব্যক্তি দেখে খণ্ড খণ্ড রূপে। বিশ্বচেতনাই পারে এই দেখার খণ্ড খণ্ড দৃষ্টিকে অখন্ড রূপ দিতে।[১০]

আরো বলা যায় যে মন স্বতন্ত্র ভাব নিয়ে বিরাজ করে বলে মনের বিরুদ্ধতা চলে প্রাণের সঙ্গে, দেহের সঙ্গে, কারণ প্রাণ ও দেহের যে সীমিতভাব আছে, সেটা মন অতিক্রম করতে চায়। দেহের জড়ত্ব, প্রাণের আবিলতা মনের ঊর্ধ্বগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দেহ প্রাণের জড়ত্ব মনের গতিকে ব্যাহত করে। আত্মার আলোকে আবছা করে। মনের এই সংঘর্ষে দেহ, প্রাণের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন ব্যক্তি শুধুই নিরবচ্ছিন্ন বাস্তব সুখ ভোগ করতে চায়। তখন মনের এই দ্বন্দ্বকে পরিত্যাগ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই সমস্যার উত্তরে বলতে হয় মনের দ্বন্দ্ব মিটবে। তার জন্য মনের বিভিন্ন স্তরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ চাই। সাধারণ মানুষের চেতনা যেহেতু মনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, তাই মনের দ্বন্দ্ব মেটাতে সে অপারগ হয়েছে। শ্রী অরবিন্দের চিন্তাধারা অনুযায়ী যদি মনের বিস্তার বা মনের বিভিন্ন স্তরগুলি স্বীকার করা যায় - উচ্চমন প্রভাসমন, বোধিমন, অধিমন -তাহলে বোঝা যাবে মনের উত্তরণ হতে হতে মন যখন অধিমন বা বিশ্বচেতনায় উত্তীর্ণ হয় তখন সেই মনে সকল দ্বন্দ্বই এক অখণ্ড অসীম ব্যপ্তিতে ধরা দেয়।[১১]

পার্থিব জীবন এক যান্ত্রিক বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই যান্ত্রিক বাসনা থেকে সে মুক্ত হতে পারেনা। সচ্চিদানন্দময় পরমপুরুষ তো নিত্যমুক্ত। তাঁর কোন বন্ধন নেই অথচ তাঁরই প্রকাশ যে জড়বাস্তব তা কঠিনভাবে শৃংখলে আবদ্ধ, যান্ত্রিক নিয়মের বশীভূত। অজ্ঞানের শক্তির এতটাই প্রাবল্য যে প্রকৃত সত্য ঢাকা পড়ে যায়। প্রকৃত সত্যের প্রকাশ সাধন কি ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব? - এরূপ জিজ্ঞাসাও আমাদের মনে জাগে।

এর উত্তরে বলতে হয় শ্রী অরবিন্দের কাছে ব্যক্তিমানুষ ছিল ঈশ্বর সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন মনের উৎস যেমন বিশ্বচেতনার মধ্য দিয়ে অতিমানস, তেমনি প্রাণের উৎস চিৎশক্তি। এই দুটিই সৎ বা সচ্চিদানন্দময়ের মূল শক্তি। সেই রকম জড়ের উৎস কে অনুসন্ধান করতে হবে। বিজ্ঞান বলে যে জড় অথবা দ্রব্য প্রকৃত সত্য এবং সৃষ্টির মূল। জড়ের উৎস থেকেই বাহ্যিক দৃশ্য বা ঘটনাবলী উৎসারিত হয়ে থাকে, আবার সেই ঐক্যমূলেই ফিরে যায়। তাদের কাছে সৃষ্টির মূলে কোন আধ্যাত্মিক সত্য নেই। যদিও বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করেছেন চিরন্তন সত্য বলে কিছু আছে, যাকে প্রমাণের চেষ্টা চলছে। এই চিরন্তন সত্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারলে হয়তো বিজ্ঞানের অনেক সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব হতে পারে।[১২]

শ্রী অরবিন্দের মত অনুযায়ী যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় চিরন্তন সত্য আছে, যাঁকে ব্রহ্ম, পরমসত্তা, পরমার্থসৎ, সচ্চিদানন্দময়, বিজ্ঞানঘনপুরুষ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে শ্রী অরবিন্দের দর্শনে এবং বিশ্বাস করা হয়েছে তিনি যদি পরম সত্য হয়ে থাকেন তবে যা কিছুতে তাঁর প্রকাশ তা সবই সত্য হয়ে যায়।

জড়ের মধ্যে এক শক্তি আছে যাকে বলা হয় অবসাদ ও বাধা। এটি ভগবৎপথে প্রবেশের অন্তরায়। এর দ্বারাই উৎপন্ন হয় বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা ও বিরুদ্ধতা। এর একদিকে থাকে জীবন, অপরদিকে মৃত্যু। জড়ের মধ্যে যখন প্রাণ ক্রিয়া করে, তখন প্রাণ জড়ের শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে সীমিত হয়ে পড়ে। একই ভাবে জড়ের মধ্যে যখন মন ক্রিয়া করে, প্রাণের মতই সেও জড়ের কাছে নতি স্বীকার করে সীমিত হয়ে পড়ে। সর্বদাই মন বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হয়। তার ফলে মন যে জ্ঞান অর্জন করে, তা হয় খুবই সংকীর্ণ, কখনোই স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ হতে পারে না। কখনোই এই জ্ঞান বিভেদ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। আর মনের ক্রিয়ারও কোন নিশ্চিত অগ্রগতি থাকে না।

মনের উত্তরণ স্বীকার করলে অর্থাৎ মনের যে উর্ধ্বক্রম উচ্চমন, প্রভাসমন, বোধিমন ও অধিমন তথা বিশ্বচেতনাকে স্বীকার করলে এই সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব। যখন মন মনের এই বিভিন্ন স্তরের গন্ডি অতিক্রম করে বিশ্বচেতনায় উত্তীর্ণ হবে তখনই সেখানে অতিমানসের আলোক এসে পৌঁছাবে। অর্থাৎ যখন কেউ নিজের চেষ্টায় মনের এই স্তরগুলোকে অতিক্রম করে অতিমানসের ঠিক নিম্নবর্তী স্তর বিশ্বচেতনায় পৌঁছাবে তখন তাকে অতি মানুষের শক্তি ও জ্যোতি টেনে নিয়ে যাবে অতিমানস লোকে যেখানে তার পরাচেতনা তথা অখণ্ড বিশ্বাতীত সত্তার জ্ঞান হবে। এই স্তরেই আবির্ভাব হবে বিজ্ঞানময় পুরুষ তথা দিব্য-মানবের। বিশ্বচেতনার মাধ্যমে সাধারণ মন বা প্রাকৃত মনের সঙ্গে অতিমনের এই মিলনের ফলে মনের সকল বিকৃতি, দ্বন্দ্ব, অসত্য, বিচ্ছিন্নতা দূর হবে দেবে। অতিমন তখন বিশ্বচেতনার জ্যোতি ও আলোক ছড়িয়ে দেবে প্রাকৃত মন ও জড়দেহে।[১৩]

মানব জীবনে মনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন যা চায়, তা সে পায় না। আর মনের চাওয়ার তো কোন শেষ নেই। মনের সব চাওয়াই পার্থিব সুখের চাওয়া। পার্থিব সুখের চাওয়ার কখনো পরিতৃপ্তি হয় না। পরিণামে আসে দুঃখ, অশান্তি। ব্যক্তিমন যেমন পার্থিব সুখের পেছনে ছোটে, তেমনি ঐ ব্যক্তিমন জানতে চায়, বিশ্বপ্রকৃতিকে অতিক্রম করে এমন কোন অপার্থিব সুখ আছে কি, যা পরিতৃপ্তির সন্ধান দেয় শান্তির আশ্রয় হয়?

এই প্রসঙ্গে শ্রী অরবিন্দ বলেন – মানুষের সত্তার দুটি দিক। একটি নশ্বর বহিঃসত্তা, অপরটি শাশ্বত আন্তঃসত্তা। এটিই চৈত্যসত্তা। বহিঃসত্তার অংশ দেহ,প্রাণ, মন। এই সত্তাই প্রাকৃত মনের দ্বারা আবদ্ধ। চৈত্যসত্তা এই বহিঃসত্তাকে যন্ত্রবৎ ব্যবহার ও পরিচালনা করে। দেহ, প্রাণ, মন সমন্বিত বহিঃসত্তা জন্ম মৃত্যুর অধীন। কিন্তু চৈত্যসত্তা অমর। চৈত্যসত্তাই ব্যক্তির মূল সত্তা। চৈত্যসত্তা প্রাণ ও অহং থেকে ভিন্ন। কামনা, বাসনা, আবেগ ইত্যাদি মূলত বহিঃসত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। চৈত্যসত্তা এর পরিচালক। অহং থেকে চৈত্যসত্তার প্রভেদ এই যে, অহংসত্তা দৈহিক, প্রাণিক ও মানসিক সত্তার দ্বারা গঠিত এক নশ্বর সত্তা। কিন্তু চৈত্যসত্তা সেরূপ নয়। এটি শাশ্বত। শ্রী অরবিন্দ বলেন- এই চৈত্যসত্তাই মানস বিবর্তনের উত্তরপর্বের প্রতীক্ষায় নিজেকে সচেষ্ট করে রাখে। এই চৈত্যসত্তাই অপার্থিব সুখের অন্বেষণে নিজেকে রূপান্তরিত করে।

প্রথম পর্বে আমাদের হৃদয়ে প্রদেশে পরমসত্তার যে অংশ অতি সূক্ষ্মভাবে সুপ্ত হয়ে আছে, তাকে জাগ্রত করে স্থাপন করতে হবে জীবনের পুরোভাগে। – একে বলে চৈত্য-রূপান্তর। এই চৈত্য-রূপান্তরের ফলেই ঘটে চিন্ময় রূপান্তর, যা ঘটে বিশ্বচেতনার স্তরে। অর্থাৎ যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সত্তার প্রতিনিধিত্ব চৈত্যপুরুষ বা জীবাত্মা করছে, সেই সত্তার সঙ্গে অপরোক্ষ নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন। এই সংযোগ স্থাপিত হলেই চেতনা প্রবেশ করবে সমস্ত আকার আকৃতির ঊর্ধ্বে। সাধকের তখন পরমসত্তার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব হবে। সাধকের চেতনা পরিণত হবে বিশ্বচেতনায়। – এটি চিন্ময় রূপান্তর। অর্থাৎ যে ব্যক্তিমন অপার্থিব সুখের অন্বেষণে পরিতৃপ্তির সন্ধান পেয়েছে, তা হল বিশ্বচেতনার স্তরে অবস্থিত মন। অতএব বিশ্বচেতনার অস্তিত্বকে স্বীকার করতেই হবে।[১৪]

এই ভাবে বিশ্বচেতনার স্তরে উত্তরণ ঘটলে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটবে। যার ফলস্বরূপ ব্যক্তির প্রাকৃত জীবনের নানান সমস্যা, জটিলতা, দৈনন্দিনকার জীবনের নানান দ্বন্দ্ব, বিরোধ ইত্যাদির মোকাবিলা করা ব্যক্তির পক্ষে সহজ হয়ে উঠবে। ব্যক্তিসত্তার আমূল রূপান্তর সম্ভব হবে।

বিশ্বচেতনা সম্পর্কে আলোচনা কালে উক্ত অধ্যায়গুলিতে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে এটি মনের উত্তরণের বা চেতনার উত্তরণের এমন একটি স্তর, যেখানে পৌঁছাতে পারলে ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে অতিমানস শক্তির অবতরণের জন্য। অর্থাৎ সাধক যদি এই বিশ্বচেতনার স্তরে উত্তীর্ণ হন তাহলে সচ্চিদানন্দময়ের অতিমানস শক্তি ও আলোক নেমে আসবে এই মর্তে। রূপান্তরিত হবে চেতন ও জড়ের প্রাকৃত সত্তা।

সিদ্ধান্ত (Conclusion) **:**

অতএব এটা বোঝা যাচ্ছে মহাশক্তিকে চেতনার স্তরে অবতরণের জন্য প্রথমেই যে আদর্শটির প্রয়োজন সেটি হল সচিদানন্দময় পরমসত্তা বা বিজ্ঞানঘন পুরুষকে লাভ করার জন্য সাধকের থাকবে তীব্র আস্পৃহা, দেহ,প্রাণ, মনের সর্বাঙ্গীন চেতনার সর্বতমুখী ব্যাকুল আবেগ। শ্রী অরবিন্দ তাঁর 'যোগসমন্বয়' গ্রন্থে বলেছেন - অতি উৎসাহ, তীব্র ব্যাকুলতা এবং প্রেমাবেগ এদের সার্থক অর্জনই হল সাধক জীবনের প্রথম করণীয় বা অধ্যাত্মসিদ্ধি লাভের আবশ্যিক প্রস্তুতি। অবশ্য এই তীব্র আস্পৃহা আনার জন্য মনের উচিত এক নিরবচ্ছিন্ন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ শান্তি ও নিস্তব্ধতা লাভ করা। মনের স্বাভাবিক গতি যেহেতু চঞ্চলতা, তাই এই মহাশক্তি লাভ করার জন্য যে তীব্র আস্পৃহা দরকার, তার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে মনের স্থিরতা, শান্তি ও সমতার প্রয়োজন।

শ্রী অরবিন্দ বলেছেন-

> "মন নীরব হলে অতিমানস চেতনাটি আপনা থেকেই যে আসে তা নয়। মানুষী মন আর অতিমানসের মাঝে বহু অবস্থা বা লোক বা স্তর আছে। নীরবতা মনকে এবং সত্তার আর সব অংশকে মহত্তর বস্তুর দিকে উন্মীলিত করে- কখনো বিশ্বগতচেতনার দিকে, কখনো বা শাশ্বত আত্মার উপলব্ধির দিকে, কখনো আবার ভগবানের সত্তা বা শক্তির দিকে, কিম্বা মানবের মানস-চেতনার অপেক্ষা একটা বৃহত্তর চেতনার দিকে। মনের নীরবতাই হল এইসব রকম অনুভূতি আসবার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থা, আমাদের যোগেও এই হল সবচেয়ে অনুকূল অবস্থা।"[১৫]

দ্বিতীয় আদর্শ হল ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য যে তীব্র আস্পৃহা এবং তা নির্ভর করে শ্রদ্ধাপূর্বক সমর্পণের উপর। তাই বলা যায় শ্রদ্ধা, সচ্চিদানন্দময় ভগবানের উপর নির্ভরশীলতা ভাগবত শক্তির কাছে পূর্ণ সমর্পণ ও আত্মদান – এই সব কিছুই অপরিহার্য। শুধুমাত্র স্থির সংকল্প, তীব্র আস্পৃহা, শ্রদ্ধাপূর্বক পূর্ণ সমর্পণ থাকলে ভাগবত শক্তি বা পরমসত্তার সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি ব্যক্তির সহায় হয়ে বিশ্বচেতনার স্তরে অবতরণ করবে তারপর বিশ্বচেতনার মধ্য দিয়ে মন প্রাণ হয়ে জড়ের স্তরে অবতরণ করতে সক্ষম হবে।

তৃতীয় আদর্শটি হল পরিবর্জনের বিষয়। চেতনার উত্তরণের জন্য তথা সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য শ্রী অরবিন্দ বলেন ব্যক্তিমনের যা ভুল বৃত্তি সেগুলি লক্ষ্য করে, সেগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। তাই এগুলিকে প্রতিনিয়ত পরিবর্জন বা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। মনের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে, কিন্তু সতেজ বীর্যে উদ্দীপ্ত হয়ে, বিসর্জন দিতে হবে যা কিছু অসুন্দর বা অশুভভাব। কারণ এগুলিই ব্যক্তির পায়ে শৃংখল পরিয়ে ব্যক্তিকে জড়িয়ে রাখে অন্ধকার ময় জীবনে। তাই উজ্জ্বল আলোকে স্নাত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষার সকল প্রকার অশুভ শক্তিকে বর্জন করতে হবে।

চতুর্থ আদর্শ হল বাসনা, আহার ও কামকে দমন করা। বাসনা বর্জন করার অর্থ হল বাসনার অন্তর্গত ক্ষুধা বর্জন করা। বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে অনেক সময় দরকার। কিন্তু একবার যদি বাসনাকে বাইরের শত্রু হিসেবে দেখা যায় তাহলে নিশ্চিত তা দূর করা সম্ভব। আহার বর্জন করা মানে আহারের উপর আসক্তি ত্যাগ বোঝায়। প্রাণের ও শরীরের উপর কামাবেগের আক্রমণ থেকে সাধককে সম্পূর্ণ দূরে রাখতে হবে।কামকে জয় করতে না পারলে শরীরের মধ্যে দিব্য-চেতনা ও দিব্য-আনন্দ স্থিতিলাভ করতে পারে না।

পঞ্চম আদর্শ হল সাধন পথ পরিক্রমায় সদা জাগ্রত থাকা, একান্তভাবে একনিষ্ঠ হয়ে ওঠা। মন, মুখ ও ব্যবহারকে এক করে সকল বাহ্যস্পর্শের সম্মুখীন হতে শেখা, দ্বন্দ্ব থাকবে, তাই এক অতন্ত্র সতর্কভাব নিয়ে এই দ্বন্দ্বকে জয় করে সুষ্ঠুভাবে সাধন জীবন গড়ে তুলতে হবে।

ষষ্ঠ আদর্শ হল আত্মদর্শন ও আত্মবিজয়ের জন্য চাই সুতীব্র সংগ্রাম, প্রতিটি তপস্যা প্রয়াসকে দেখতে হবে অপরূপভাবে।

সপ্তম আদর্শ হল দিব্য-জননীর ক্রিয়াশক্তির সর্বতোমুখী বিচিত্রধারা সাধকের অন্তরে নিরন্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হবে।

অষ্টম আদর্শ হল ভগবান ও ভগবতীর প্রতি অখন্ড ভালবাসা।

নবম আদর্শ হল প্রতিক্ষেত্রে, প্রতিঅবস্থায়, সাধকোচিত সত্যকার ভাব আমাদের চেতনার মধ্যে ধরে রাখা অবিচলভাবে।

সর্বশেষ আদর্শ হল প্রাকৃত চেতনা সর্বক্ষণের জন্য ভরে থাকবে এক সহজ আনন্দের দীপ্ত দ্যুতিমালায়। আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে সাধককে তাঁর সাধনজীবনে অগ্রসর হতে হবে। তবেই তো সচ্চিদানন্দময়ী মাতৃশক্তির সান্নিধ্য লাভ করবেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচনার বিষয় ছিল তা হল কিভাবে বা কোন্ আদর্শের পথ ধরে অগ্রসর হলে আমরা বিশ্বচেতনাকে লাভ করব, এবার দেখা যাক এই বিশ্বচেতনা লাভ করার পর আমাদের অবস্থানটি ঠিক কিরকম হবে? শ্রী অরবিন্দের মতে জড় প্রকৃতি চায় আমাদের মধ্য দিয়ে পূর্ণভাবে ফুটে উঠতে। পূর্ণ ভাবে ফুটে ওঠার অর্থ আপন সত্তা সম্পর্কে পূর্ণচেতন হওয়া। আর আপন নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকতে হলে চাই আত্মস্বরূপ ও আপন সত্তার সমগ্র সত্য সম্পর্কে পূর্ণভাবে সচেতন হওয়া। এই আত্মসচেতনতাকেই বলে অধ্যাত্মজ্ঞান। সাধকের সকল জ্ঞানক্রিয়াতে চলছে চেতনার আত্মস্বরূপে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা। কিন্তু মাঝে মাঝেই চেতনা হয়ে পড়ে আত্মবিস্মৃত। তখন সে প্রাণপণ চেষ্টা করে আত্মচেতনায় ফিরতে। এই হল আত্ম-অবিদ্যার আত্ম-বিদ্যায় রূপান্তরিত হওয়া। আত্ম স্বরূপ, আত্মচেতনায়, আত্মশক্তিতে ও আত্মানন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠা এবং এই পূর্ণতার মধ্যে নিত্যস্থিতি লাভ করাকেই বলে দিব্য-জীবন লাভ।

সমস্ত সত্তা যেহেতু এক অখণ্ড সত্তা, তাই পূর্ণ হয়ে উঠতে হলে সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে হবে। সকল সত্তার মধ্যে নিজেকে পাওয়া এবং নিজের মধ্যে সকলকে পাওয়া, সকলের চেতনায় চেতন হওয়া, বিশ্বশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শক্তিতে পূর্ণ হওয়া, বিশ্বের সমস্ত কর্ম ও অনুভবকে নিজের মধ্যে বহন করা এবং নিজেরই কর্ম ও অনুভব বলে মনে করা, সর্বভূতের আত্মাকে নিজের আত্মারূপে অনুভব করা সকল সত্তার আনন্দকে আপন আনন্দরূপে গ্রহণ করা- এগুলি হল পূর্ণ দিব্য-জীবনের অপরিহার্য শর্ত। অর্থাৎ বিশ্বচেতনার স্তরে পৌঁছালে সত্তার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ব্যাক্তির দিব্য-রূপান্তর ঘটবে এবং মর্ত্যধামে প্রতিষ্ঠিত হবে দিব্য-জীবন।

Reference :

১. রায়, ডক্টর দিলীপ কুমার, *শ্রী অরবিন্দ দর্শন*, শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা,২০১৭, পৃ. ২৫
২. শ্রী অরবিন্দ, *কারাকাহিনী*, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম পন্ডিচেরী,২০১২, পৃ. ৩৮
৩. তদেব, পৃ. ৪৭
৪. শ্রী অরবিন্দ, *পৃথিবীতে অতিমানস বিকাশ*, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম পন্ডিচেরী,২০১, পৃ. ৩৪
৫. শ্রী অরবিন্দ, *শ্রীঅরবিন্দ: নিজের কথা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড*, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট,১৯৫৭, পৃ. ৫৫
৬. রায়, সুনীল, *শ্রী অরবিন্দ দর্শন মন্থনে*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৬২
৭. শ্রী অরবিন্দ, *উপনিষদাবলী*, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম পন্ডিচেরী,২০১৯, পৃ. ৩৬
৮. শ্রী অরবিন্দ, *মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে*, শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দির কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৩

৯. বন্দোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ, *প্রবন্ধাবলী*, সাহিত্য সংসদ, সম্পাদনা ভট্টাচার্য সৌরীন, ২০২৩, পৃ. ৫৪

১০. শ্রী অরবিন্দ, *এই বিশ্বের প্রহেলিকা*, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম পন্ডিচেরী, ২০১৫, পৃ. ২৭

১১. শ্রী অরবিন্দ, *মানবযুগচক্র*, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম পন্ডিচেরী, পৃ. ১৭

১২. নারায়ণপ্রসাদ, *শ্রী অরবিন্দ আশ্রম জীবন কথা*, মাতৃমন্দির, শ্রী অরবিন্দ কর্মী সংঘ ট্রাস্ট, ২০১৬, পৃ. ২৬

১৩. রায় বর্মন, সুশীল চন্দ্র, *শ্রী অরবিন্দ অনুধ্যান*, শ্রী অরবিন্দ কর্মী সংঘ ট্রাস্ট মাতৃমন্দির, ২০০৭, পৃ. ১৩

১৪. শ্রী অরবিন্দ, *যোগসমন্বয়*, শ্রী অরবিন্দ আশ্রম পন্ডিচেরী, ২০১৬, পৃ. ৩৫০

১৫. শ্রী অরবিন্দ, *যোগসাধনার ভিত্তি*, শ্রী অরবিন্দ পাঠ মন্দির কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৮